সুলতানি শাসনামলে বাংলা সাহিত্য

গোলাম আশরাফ খান উজ্জ্বল

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও অনুবাদক
এনায়েত রসুল

ভূমিকা

দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। জীবনের বেশি সময় ব্যয় করেছি,

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্ন নিদর্শন নিয়ে। এরই মাঝে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় জলপরী ফুলপরী নামে একটি ছড়া গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ফলে সাহিত্য নির্ভর আরো একটি গ্রন্থ করার সাহস জাগে মনে। এরই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধগুলো দুই মলাটে আবদ্ধ করার প্রয়াস পাই। গ্রন্থটি প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা হয় সম্প্রীতি প্রকাশের কর্ণধার রেজাউল করিম বিল্লালের সাথে। তাঁর সার্বিক সহযোগিতায়ই *সুলতানি শাসনামলে বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে।

সুলতানি শাসনামলে বাংলা সাহিত্য এই নামে একটি মাত্র প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটির নামেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যে মা, বাংলা সাহিত্যে কারবালা, পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সিরাজ পরিবার, বাংলার ঋতু শরৎ, বাংলা সাহিত্যে নদী, দুশো বছর পেরিয়ে বাংলা সংবাদপত্র, মফস্বল সংবাদপত্রের সুখ দুঃখসহ চিরায়ত সাহিত্য নির্ভর প্রবন্ধ।

আরো আছে রাজধানী ঢাকার ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, মসজিদ নির্মাণে নারী, মোগল শাসনামলে বাংলার সাহিত্যিক এমন ভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ। ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলোর জন্য আসকার ইবনে শাইখ, অধ্যাপক আব্দুল করিম ও ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের বইগুলোর সহযোগিতা নিয়েছি। এই গ্রন্থে আছে বাউল সম্রাট লালনকে নিয়ে কিছু আলোচনা। কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস, কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নীতি কবিতা ও কবি বন্দে আলী মিয়ার শিশুসাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ।

এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, যায়যায়দিন, সাপ্তাহিক নিখুঁত খবর ও সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের আগে অন্য কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে এখানে। যা পাঠকদের ভালো লাগবে। ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে কেউ নই। ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সম্প্রীতি প্রকাশের কর্ণধার রেজাউল করিম বিল্লালকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

গোলাম আশরাফ খান উজ্জ্বল
কেওয়ার খানবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ।
সেলফোন : ০১৭৮২৩৯৫৯৮৫

সূচিক্রম

বিশ্বসাহিত্যে মা ♦ ১১
বাংলা সাহিত্যে কারবালা ♦ ১৪
পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সিরাজ পরিবার ♦ ১৭
দুশো বছর পেরিয়ে বাংলা সংবাদপত্র ♦ ২১
সুলতানি শাসনামলে বাংলা সাহিত্য ♦ ২৪
কবি কাজী নজরুলের যত প্রাপ্তি ♦ ২৬
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র ♦ ২৯
কবি গোবিন্দ দাস : বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যিক ♦ ৩২
কাজী নজরুল ইসলামের চিঠিপত্র ♦ ৩৫
কবি বন্দে আলী মিয়ার শিশুসাহিত্য ♦ ৩৯
সাড়ে পাঁচশ বছরের ঢাকা ♦ ৪১
মোগল শাসনামলে বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক ♦ ৪৬
শতবর্ষ ছাড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ♦ ৪৮
বাংলার ইতিহাসের উপাদান ♦ ৫১
বাংলাদেশের মফস্বল সংবাদপত্রের সুখ-দুঃখ ♦ ৫৫
ইতিহাসের উষালগ্ন হতে বাংলা ভাঙন প্রক্রিয়া ♦ ৫৯
বাউল সম্রাট লালনের কথা ♦ ৬২
বাংলাদেশে মসজিদ নির্মাণে নারী ♦ ৬৪
ঢাকার ঈদ উৎসব ♦ ৬৭
বাংলার ঋতু শরৎ ♦ ৭০
উত্তরাঞ্চল বাঁচাতে প্রয়োজন তিস্তা চুক্তি ♦ ৭২
মদন মোহনের উপদেশমূলক সাহিত্য ♦ ৭৬
বাংলা সাহিত্যে নদী ♦ ৭৮

বিশ্বসাহিত্যে মা

মা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি প্রচণ্ড আকর্ষণীয় স্নেহময়ী ও আবেগময় শব্দ। মায়ের মধ্যেই সন্তানের অস্তিত্ব নিহিত। মা আছে তো সন্তান আছে। গর্ভজাত হোক অথবা দত্তকই হোক, সেখানে মা মানেই একটা মায়াবী স্নেহময়ী অবস্থান। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই মাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হয়েছে। অতীতে মাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হয়েছে। বর্তমানে হচ্ছে। ভবিষ্যতেও মাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হবে। কী গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা সিনেমা। মা ও সন্তান সম্পর্কে প্রবচন ও সাহিত্যে একটি কথা প্রচলিত সমগ্র বাংলায় 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়' অর্থাৎ মায়ের অবস্থানটি অত্যন্ত সহনশীল, স্নেহময়ী ও নির্ভেজাল। সন্তানেরা মায়ের সাথে অসদাচরণ করলেও মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করে না। এটা শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যই নয়, মাকে নিয়ে সাহিত্য রচনা হয়েছে বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে।

ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস 'মা' যা বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে পঠিত উপন্যাস। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ মা উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়া বিপ্লবের সেই সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেক্ষাপটে এক শ্রমিক পরিবারের নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ। মা, ছেলে প্যাভেল, প্যাভেলের বন্ধুদের আপন মনে করেন। তাই ছেলে ও ছেলের বন্ধুদের সংগ্রামকে সমর্থন করেন। ছেলে প্যাভেল কারারুদ্ধ হন। মা আন্দোলন চাঙ্গা রাখতে রুটির সাথে বিলি করতেন আন্দোলনের ইশতেহার। এক সাধারণ মা হয়ে ওঠেন নির্যাতিত মানুষের বাঁচার এক আশ্রয়স্থল। সর্বজনীন মা হয়ে ওঠেন তিনি।

বিশ্বসাহিত্যে আরো এক মা উপহার দেন বের্টোলেট ব্রেশট। তিনি অ্যানা ফিয়েলিং। যার ব্যাপক পরিচিতি মাদার কারেঞ্জ নামে। 'যুদ্ধের গতি

অনুসরণ করে চলে তার খাবারের গাড়িটি'। এ খাবারের গাড়িটি তার জীবিকার একমাত্র সম্বল। এটির আয় দিয়ে চালাতে হবে তার সংসার। যেখানে বাস করে একটি রোগা মেয়ে আর দুই ছেলে। আসলে সে সাহসী নয়। তবুও বেঁচে থাকতে হবে। বাঁচার লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। যুদ্ধের এ সময় পার করতে হবে মাদার কারেঞ্জকে। মাদার কারেঞ্জকে কলকাতার প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী হিম্মৎমাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। একটি মজার ব্যাপার হলো, তার তিনটি সন্তানের বাবা তিনজন। আর এ তিনজনকে বাঁচাতে মরিয়া তিনি। তিনিও হলেন একজন সর্বজনীন মা।

বাংলা সাহিত্যে মা ও জননী নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তবে মনে দাগ কেটেছে দুটি উপন্যাস। একটি আমাদের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের 'জননী', অন্যটির রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শওকত ওসমানের জননী ট্র্যাডিশনাল উপন্যাস। নিরুপায় জননী শত চেষ্টা করেও ধনীর লালসার শিকার এড়াতে পারেনি। সন্তান বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আত্মহত্যা করে। জননীর ঘর ভেঙে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে শ্যামা-মায়ের চরিত্রে। সে যতটা না মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তার চেয়ে ঢের বেশি জননী। সে গর্ভে ধারণ করতে চায় একটি সন্তান। তীব্রভাবে বাঁচতে ইচ্ছা হয় তার সন্তানের মধ্য দিয়ে। এজন্য শরীর মন সন্তান জন্মদানের জন্য সৃষ্ট। সেটা যেন তার অস্তিত্বের শক্তি ও স্বীকৃতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প 'আহ্বান'। এ আহ্বান গল্পে জমির করাতির বউ এক অসাম্প্রদায়িক মা হিসেবে আবির্ভূত। বিভূতিভূষণ হিন্দু-মুসলমান দু'সম্প্রদায়ের দু'জনকে চিত্রায়িত করেছেন। কিন্তু জমির করাতির মুসলমান বৃদ্ধ বউকে একজন মমতাময়ী মা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন সার্থকভাবে। যার মৃত্যুর সময় মমতাবোধই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে জমির করাতির বউয়ের মধ্য দিয়ে।

বাংলা কথাসাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী', যা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য সৃষ্টি। এ উপন্যাসের একটি মনে রাখার মতো চরিত্র হলো সর্বজয়া। এক পয়সার সঙ্গতি নেই সংসার চালানোর। কত কষ্টে অপু আর দুর্গার খাদ্য জোগাড়। তবে সর্বজয়ার কাছে দুর্গার চেয়ে অপুর কদর বেশি। কষ্ট করে জমানো টাকা দিয়ে অপুকে কলকাতায় পাঠায়। অপু আর মায়ের কোলে ফিরে আসেনি। তার পরও অপু আর দুর্গার সর্বজনীন মা সর্বজয়া।

বাংলা সাহিত্যে গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে পালিত মায়ের স্নেহ-মায়া-মমতা কোনো অংশে কম নয়। অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসে এমনই এক মাকে দেখা যায়। অরবিন্দের দুই স্ত্রী মনোরমা ও ব্রজরানী। অরবিন্দ মনোরমাকে দূরে রেখে বাবার আদেশে ব্রজরানীকে বিয়ে করে। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে ক্ষুব্ধ ব্রজরানীর হৃদয় শান্ত হলো মনোরমার পুত্রের মা বলে ডাকায়।

শরৎচন্দ্র কিন্তু সবচেয়ে এগিয়ে এ ব্যাপারে। গর্ভধারিণী নয় কিন্তু মা চরিত্র অঙ্কনে বিখ্যাত তিনি। বিন্দুর ছেলে [বিন্দু/কাকিমা] রামের সুমতি [বড় ভাবী] মেজদিদি [দিদির জা]-এরা সবাই মায়ের স্থানে।

বনফুলের মজার একটি গল্প 'গণেশ জননী'। এটি বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমধর্মী গল্প। কোনো এক কারণে মধ্যবিত্ত পরিবারের দম্পতি একটি বাচ্চা হাতি পুষেছিলেন। ঘটনাচক্রে সে এক ঝুড়ি আম খেয়ে ফেলে। তিনি কেবল বলেছিলেন– 'আমাদের জন্য দুটোও রাখনি'। মায়ের বকুনিতে বাচ্চা হাতিটি খাওয়াদাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলো। মানুষরূপী মা লেবুর রস করে বাচ্চা হাতিকে অনুনয় করে বললেন, 'একটুখানি খাও না লক্ষ্মীটি'। এখানে ব্যতিক্রমী এক মাকে পেলাম বনফুলের হাত দিয়ে। মা কনসেপ্টকে বিষয় করে অনেক সিনেমা হয়েছে। সিনেমা হয়েছে এশিয়া, ইউরোপেও। 'সারগেট মাদার' নামে একটি কোরিয়ান ছবি আর হলিউডের 'স্টেপ মম'। সৎমা হয়ে ওঠেন এক মমতাময়ী মা।

হলিউডের ১৯৩৭ সালের ছবি 'স্টেলা ভালাস' এখানেও মায়ের মমতা দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশের ছবি 'সত্যমিথ্যা' অথবা 'সবার ওপরে মা' একটি অনবদ্ধ অবস্থান মায়ের। বোম্বের 'মাদার ইন্ডিয়া' টালিগঞ্জের ছবি '১৯ এপ্রিল'–এ ছবিগুলোতে মায়ের সাথে সন্তানের গুরুত্ব বন্ধনে আধুনিকতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্যতিক্রমী এক মা চিত্রায়ন করেন 'চোখের বালি' উপন্যাসে। মায়ের পছন্দের পাত্রীকে প্রত্যাখ্যান করে মহেন্দ্র নিজের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। ক্ষুব্ধ রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মহেন্দ্রের সম্মুখে। পরে অবশ্য মা অনুশোচনাও করেছিলেন তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো স্নেহময়ী, মমতাময়ী মায়ের। যিনি সর্বজনীন মা। যার আঁচলের নিচে সন্তানের আশ্রয়স্থল। তাই কবির ভাষায় বলতে হবে– মা কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু জেনো ভাই/ ইহার চেয়ে নাম যে মধুর তিন ভুবনে নাই।

বাংলা সাহিত্যে কারবালা

কারবালা ইরাকের একটি শহর। শহরটি ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। এ শহরে ঘটেছিল ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। মহানবি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর মেয়ের ঘরের নাতি, হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর নয়নের মণি হযরত হোসাইন (রা.) এজিদ বা ইয়াজিদ বাহিনীর সীমার কর্তৃক শাহাদাত বরণ করেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্পসংখ্যক পারিবারিক লোক নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে হোসাইন (রা.) শহিদ হন। কারবালার বিষয়কে উপজীব্য করে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে অনেক সাহিত্য রচনা হয়েছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নেই। হিজরি ৬১ সালের ১০ মহরম কারবালায় এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল। যা নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে কারবালার হৃদয়বিদারক বিবরণ নিয়ে পুথি সাহিত্য হয়েছে। হয়েছে বিষাদসিন্ধুর মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস। কারবালা ও মোহররম নিয়ে কবিতা, গজল ও ইসলামি সংগীত রচিত হয়েছে। বাংলা ইসলামি কবিতায় এরকম চরণ রয়েছে "নবীর নাতি হোসাইন দশই মহররমের দিন/ধর্মের নামে শহীদ হলেন কারবালার ময়দান।" কবি এখানে হোসাইন (রা.)-কে ধর্মযুদ্ধে শহিদ দেখিয়েছেন। এখানে হোসাইন (রা.) সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ফোরাতের তীরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। তাই তো তাঁকে নিয়ে কাসিদা, ইসলামি সংগীত, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা ও ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মোহররমের হৃদয়বিদারক ঘটনাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতার নাম হলো "মোহররম"। এই মোহররম কবিতায় কবি কাব্যঢংয়ে কারবালার দৃশ্য

ফুটিয়ে তুলেছেন। যা পাঠক হৃদয়ে বেদনা বিধুর ভাব সৃষ্টি করে। এখানে আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের "মোহররম" কবিতার কয়েকটি চরণ তুলে ধরা হলো। "নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া/ "আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া/ "কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে//সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে//রুদ্র মাতম ওঠে দুনিয়া দামেশকে/জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে–/ হায় হায় হোসেনা ওঠে বোল ঝঞ্ঝায়/তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পাঞ্জায়/ উন্মাদ দুলদুল ছুটে ফেরে মদিনায়/আলিজাদা হোসনের দেখা হেথা যদি পায়।" এখানে কবি নজরুল হযরত আলী (রা.) ও মা ফাতেমা (রা.)-এর প্রিয় দুলাল হোসেন (রা.) কারবালা ময়দানে এজিদ বা ইয়াজিদ সেনাপতি কুচক্রি সীমার কর্তৃক শাহাদত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

কারবালা যুদ্ধ একটি সাধারণ বা নিছক কোনো যুদ্ধ নয়। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.) সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। ইসলামে যে সত্য ও ন্যায়ের মহিমার কথা বারবার বলা হয়েছে, তা ভুলে গিয়ে এজিদ জোরজুলুম আর নারীদের অত্যাচারের খড়্গ সৃষ্টি করে। এরই বিরুদ্ধে পরিবারের গুটিকতক সদস্য নিয়ে সত্যের পক্ষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন হযরত হোসাইন (রা.)। এ যুদ্ধে হোসাইন পরিবারের পুরুষ, শিশু ও নারী অংশগ্রহণ করে শহিদ হন।

কারবালার যুদ্ধকে বিষয়বস্তু করে বাংলা সাহিত্যের আরো একটি বিখ্যাত উপন্যাস বিষাদ-সিন্ধু। মীর মোশাররফ হোসেনের লেখা "বিষাদ-সিন্ধু" পাঠ করে আবেগ তাড়িত হয়নি এমন মুসলমান বাঙালির সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ উপন্যাসে মায়মুনা নামক এক নারীর কূটবুদ্ধিতে ইমাম হাসান ও হোসেনের বংশ ধ্বংস হয়। পাষণ্ড সীমার, এজিদ, মারওয়ান বিষাদ-সিন্ধুর সবচেয়ে খারাপ চরিত্র। এখানে মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাস থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো, হোসেন বলিতে লাগিলেন "ভাই সকল এজিদের জীবনের প্রথম কার্যই আমাদের বংশ বিনাশ করা। যে উপায়ে হউক এজিদ আমার প্রাণ বিনাশ করিবে।" এ উক্তিটি বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের দ্বাবিংশ প্রবাহে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চবিংশ প্রবাহে দেখানো হয়েছে একটি করুণ চিত্র। সেখানে কাসেম নব বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে বাসর না করেই কারবালা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে কাসেম শহিদ হন। এখানে লেখক উপন্যাসের চরিত্রটিকে মর্মস্পর্শী

করে চিত্রন করেছেন। "কাসেমের চক্ষু একেবারেই বন্ধ হইল। ...সখিনা স্বামীর মৃতদেহ অঙ্গে ধারণ করিয়া করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, কাসেম একবার চাহিয়া দেখ, তোমার সখিনা এখনো সেই বিবাহ বেশ পরিয়া রহিয়াছে। কেশগুচ্ছ যেভাবে দেখিয়াছিলে এখনো সেইভাবে রহিয়াছে।" এখানে কারবালার একটি করুণ দৃশ্যই চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

সবচেয়ে করুণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে ষড়বিংশ প্রবাহে। মীর মোশাররফ হোসেন কারবালার সবচেয়ে ট্রাজেডিক দৃশ্যটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "কিছু দূর যাইয়া হোসেন আকাশ পানে দুই তিনবার চাহিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।...হোসেন আর নাই চল হোসেনের মস্তক কাটিয়া আনি। ...সীমার তীরবিদ্ধস্থানে খঞ্জর স্পর্শ করিল। অমনি হোসেনের শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।" এভাবে তিনি হোসেনের শহিদ হওয়ার বর্ণনা করেছেন।

মোহররম মাস এলে গ্রাম বাংলার মুসলিম কোনো কোনো নারীরা মাথায় একমাস তেল ব্যবহার করেন না। বিশেষ করে শিয়া মুসলমানরা এ নিয়ম বেশি পালন করে। তারা পোশাক-আশাকে শৈথল্য দেখায়। বাংলাদেশের অনেক স্থানে ১০ মোহররম তারিখে তাজিয়া শোক মিছিল হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় এ সকল মর্সিয়া মিছিল হয়। গ্রামবাংলায় মাজার, দরগাহ ও খানকায় তিন-চার জনে মিলে কোরাস গায়। "মোহররমের দশ তারিখে কী ঘটাইলেন রাব্বানা/কলিজা ফাটিয়া যায় গো কহিতে তার ঘটনা/হাসান মইলো জহর খাইয়া/হোসেন শহিদ কারবালায়/জয়নাল আবদীন বন্দিগো হইল/ এজিদেরই জেলখানায়/' এটি গেয়ে চাল, ডাল, টাকা তোলে। দশ মোহররম তারা শিরনি, খিচুরি করে। এ ফাতেহা করার আগে মিলাদ, দরুদ শরীফ পড়ে নবী বংশ ও ইমাম বংশের জন্য দোয়া করা হয়। এ রীতিটি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে শত শত বছর ধরে।